আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাগজ

মধ্যপ্রাচ্য

বর্ষ ০২, সংখ্যা ১৩

মার্চ-এপ্রিল ২০২৬

সম্পাদক

খুবাইব মাহমুদ

সম্পাদনা সহযোগী

আতাউল্লাহ আয়মান
আবদুল হান্নান হাসিব

বিশেষ প্রতিনিধি

নাহিন শিকদার
সাদিক শাহরিয়ার

গ্রাফিক্স ও ওয়েব ম্যানেজমেন্ট

মধ্যপ্রাচ্য টিম

প্রচ্ছদ

বিলাল বিন নূর

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

০১৮৫৯ ০২৬ ০৪৯

পরিবেশক

দারুল ইলম, ৬৫/১, প্যারীদাস রোড,
কওমি মার্কেট, ৩য় তলা বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯২০৯৯০৫৬০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, ওয়াফিলাইফ

নির্ধারিত মূল্য
৪০ টাকা মাত্র

ভিজিট করুন

www.madhyaprachya.com
madhyaprachya@gmail.com
মধ্যপ্রাচ্য-madhyaprachya

Sponsored by Tilmeez Academy

সূচিপত্র

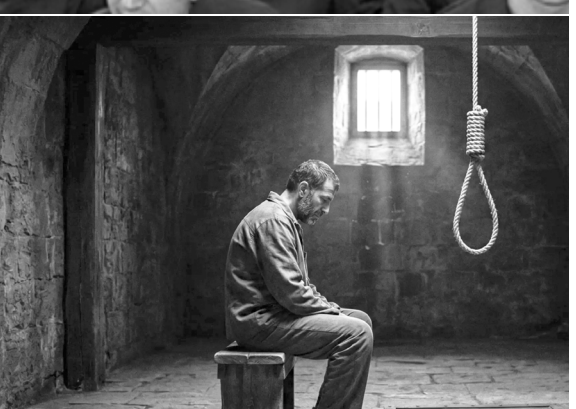

০৪ পূর্ব তুর্কিস্তান :
এক বিস্মৃত ভূমির উপাখ্যান

১৩ ইরান যুদ্ধ : মার্কিন আধিপত্যের অবসান
এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার পদধ্বনি

১৮ মুম্বাই থেকে হাইফা: মোদি-নেতানিয়াহু
ঘনিষ্ঠতা যেভাবে বদলে দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র

২২ আরাকান আর্মির উত্থান ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার
সীমান্তে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ঝুঁকি

২৬ হে আল্লাহ, দ্বীনের এই শত্রুদের সাহায্য করুন

৩১ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ
ড. বোরহান ঘালিউনের সাক্ষাৎকার

৩৪ ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ
ও তালেবানের কৌশলী অবস্থান

৩৬ ফিলিস্তিনি বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড আইন
নিয়ে যা ভাবছে তাদের পরিবার

৩৯ মুদ্রা সংস্কার থেকে সেচ প্রকল্প:
উমাইয়াদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাত-সতেরো

৪৩ টিপু সুলতান
ফাদার অব মর্ডান রকেট্রি

৫৩ এক নজরে
মার্চের মুসলিম বিশ্ব

০৪ পূর্ব তুর্কিস্তান
এক বিস্মৃত ভূমির উপাখ্যান

৪৩ টিপু সুলতান
ফাদার অব মর্ডান রকেট্রি

৩১ সিরিয়া চলমান সংঘাত থেকে দূরে নয়, বরং এর কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ দুই মাস প্রতীক্ষার পর ‘মধ্যপ্রাচ্য’ ম্যাগাজিন আবারও আপনাদের হাতে পৌঁছাচ্ছে। বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের জটিল ভূ-রাজনীতি নিয়ে নিয়মিত চর্চা করার সুযোগ সীমিত। সেই সীমিত পরিসরে ‘মধ্যপ্রাচ্য’ পাঠকদের যে আস্থা অর্জন করেছে, তা আমাদের জন্য পরম পাওয়া।

প্রকাশনার দ্বিতীয় বছরে আমরা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যার পর একটি দীর্ঘ বিরতিতে ছিলাম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি, পবিত্র রমজান এবং ঈদুল ফিতর—সব মিলিয়ে আমাদের পাঠকগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ যেহেতু শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ, তাই তাঁদের সুবিধার্থেই আমাদের এই সাময়িক বিরতির সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে আনন্দের বিষয় হলো, মার্চ ও এপ্রিলের এই যৌথ সংখ্যার মাধ্যমে আমরা আবারও নিয়মিত যাত্রায় ফিরছি। ইনশা আল্লাহ, এখন থেকে প্রতি মাসেই আপনারা নিয়মিতভাবে প্রিয় ম্যাগাজিনটি হাতে পাবেন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য যেন এক আগ্নেয়গিরি, অনবরত আগুনে জ্বলছে। যুদ্ধের লেলিহান শিখা আজ পুরো অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গাজা থেকে লোহিত সাগর, কিংবা লেবানন থেকে ইরান—সর্বত্রই আজ ড্রোন, মিসাইল আর যুদ্ধবিমানের মুহুর্মুহু শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। ইরানের উপর চাপিয়ে দেয়া মার্কিন-জায়োনিস্টের এই যুদ্ধ এই অঞ্চলকে এক মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কয়েক দশকের ছায়াযুদ্ধ ছাপিয়ে এখন একে অপরের ভূখণ্ডে সরাসরি আঘাত হানছে পরাশক্তিগুলো। আধুনিক যুদ্ধের এই ভয়াবহ ও জটিল রূপ আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

তবে চলমান কোনো যুদ্ধ নিয়ে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কারণ, যুদ্ধের গতিপথ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আজ একটি বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হয়, কয়েক ঘণ্টা পরই হয়তো দেখা যায় তার বিপরীত কোনো তথ্য সামনে হাজির হয়েছে। বিশেষ করে আজকের এই ডিজিটাল যুগে তথ্যের প্রবাহ অবিশ্বাস্য দ্রুত। কোনো ঘটনা ঘটার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা আপনার স্মার্টফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠছে। এই ‘ইনফরমেশন ওভারলোড’-এর যুগে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা যেমন কঠিন, তেমনি ঘটনার গভীরতা অনুধাবন করাও বড় চ্যালেঞ্জ।

আমরা কেবল তাৎক্ষণিক খবর পরিবেশন করতে চাই না, বরং সেই খবরের পেছনের রাজনীতি, কৌশল এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। শত প্রতিকূলতা ও সংকটের মধ্যেও ‘মধ্যপ্রাচ্য ম্যাগাজিন’ ন্যায়নিষ্ঠ বিশ্লেষণের ধারা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আমাদের এই সংখ্যায় ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের নানামুখী বিশ্লেষণ, সামরিক সক্ষমতার ভারসাম্য এবং আগামীর বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাথে আছে আরও নানধর্মী বিশ্লেষণ,ফিচার এবং সাক্ষাৎকার।

০৬.০৪.২০২৬

পূর্ব তুর্কিস্তান
এক বিস্মৃত ভূমির উপাখ্যান

পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চীনের দমন-পীড়ন নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই এ অঞ্চলে নজরদারি, গণ-গ্রেফতার, তথাকথিত ডিটেনশন ক্যাম্প এবং ধর্ম পালনে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপের সংবাদ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় উঠে আসছে। এসব পদক্ষেপ স্থানীয় মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন কে বিপর্যস্ত করেছে ভয়ানকভাবে।

বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিকে শুধু সমসাময়িক নিরাপত্তা বা জাতিগত প্রশ্ন হিসেবে দেখলে পূর্ণ চিত্র বোঝা যাবে না। এর পেছনে রয়েছে বহু শতকের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন। অনেকের দৃষ্টিতে, এটি মূলত অস্তিত্বপরিচয়, বিশ্বাস ও রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাতের ধারাবাহিকতা। আজকের সংকটকে তাই তারা ইতিহাসের এক নতুন, কিন্তু আরও জটিল অধ্যায় হিসেবে দেখছেন।

দশম শতক থেকেই পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানদের সঙ্গে চীনা শাসকদের সম্পর্ক ছিল টানাপোড়েনে ভরা। সময়ের পরিক্রমায় এই সম্পর্ক অনেকটা ‘ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া’র রূপ নেয়। মিং ও চিং রাজবংশের শাসনামলে এই দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময় মুসলিম কারাখান রাজ্য এবং বৌদ্ধ ইউতিয়ান বা খোতান রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিল। যার প্রভাব পড়ে পুরো অঞ্চলে।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ব তুর্কিস্তান ছিল স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র। তবে চীনের দখলদারির প্রচেষ্টা কখনো পুরোপুরি থেমে থাকেনি। অঞ্চলটি যখনই রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে দুর্বল হয়েছে, তখনই সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে বেইজিং। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৭৫৯ সালে প্রথমবার পূর্ব তুর্কিস্তান দখলে নেয় বেইজিং। এরপর ১৮৭৬ সালে দ্বিতীয়বার, ১৯৩৪ সালে তৃতীয়বার এবং সর্বশেষ ১৯৪৯ সালে চতুর্থবার চীনের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ধারাবাহিক দখল ও পুনর্দখলের ইতিহাসই দেখায়, পূর্ব তুর্কিস্তানে স্বাধীনতার দাবি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কখনো নিভে যায়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা এই সংগ্রাম আজও ভিন্ন বাস্তবতায়, ভিন্ন মাত্রায় অব্যাহত আছে, যা কেবল একটি অঞ্চলের নয়, বরং ইতিহাস, পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় শক্তির জটিল সম্পর্কের প্রতিফলন।

চীনের ইতিহাসে এমন কিছু সময় গেছে, যখন মুসলমানদের ধর্মীয় আচার পালনে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সীমিত পরিসরে হলেও স্বাধীনতা ছিল, বিশেষ করে প্রজাতন্ত্র যুগে। তবে পূর্ব তুর্কিস্তানের ক্ষেত্রে বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। সেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন ও দমননীতি বরাবরই অব্যাহত থেকেছে। চীনা শাসকদের আশঙ্কা ছিল, এই অঞ্চলের মুসলমানরা আবারও স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, চীনের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর যত কঠোর নীতি প্রয়োগই করা হোক না কেন, তা পূর্ব তুর্কিস্তানের তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। সেখানে দমননীতি ছিল আরও কাঠামোবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানদের প্রতি চীনের নীতি দীর্ঘদিন ধরেই ভয়ানকভাবে সহিংস। ন্যূনতম নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে দেওয়ার চেষ্টা অবিরাম যুদ্ধের মত অব্যাহত আছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

'বৃহত্তর তুর্কিস্তান' বলতে তুর্কি জনগোষ্ঠীর বসবাসরত সব অঞ্চলকে বোঝানো হয়। 'তুর্ক' ও 'স্তান'—এই দুই অংশ মিলিয়ে শব্দটির অর্থ তুর্কদের ভূমি। ইতিহাসে এই অঞ্চল 'মা-ওয়ারাউন নাহর' নামেও পরিচিত, অর্থাৎ জাইহুন ও সাইহুন নদীর ওপারের ভূখণ্ড। ভৌগোলিকভাবে এটিই মধ্য এশিয়া। তুর্কিস্তানকে সাধারণত পূর্ব-পশ্চিম এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

১৮৬৫ সালে রাশিয়া পশ্চিম তুর্কিস্তান দখল করে। পরে ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের পর 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির ভিত্তিতে অঞ্চলটিকে জাতিগত পরিচয়ে পাঁচটি আলাদা প্রজাতন্ত্রে ভাগ করা হয়। সেগুলো হলো উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তান। এসব দেশের জনগোষ্ঠীর বড় অংশ মুসলমান হলেও, বাস্তবে তারা দীর্ঘদিন ধরেই পরোক্ষ আধিপত্যের ছায়ায় বসবাস করছে।

পূর্ব তুর্কিস্তান বৃহত্তর তুর্কিস্তানের পূর্বাংশ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে অঞ্চলটি চীন ও রাশিয়ার মাঝামাঝি। এর উত্তরে মঙ্গোলিয়া ও রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল, দক্ষিণে তিব্বত ও কাশ্মীর (পাকিস্তান ও ভারতের অংশ), পূর্বে চীন এবং পশ্চিমে কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তান। এর আরও পশ্চিমে রয়েছে উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান।

আয়তনের দিক থেকে পূর্ব তুর্কিস্তান একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড। এর আয়তন চীনের মোট ভূখণ্ডের প্রায় এক পঞ্চমাংশের সমান। চীন এই অঞ্চলকে ডাকে 'শিনজিয়াং' নামে। এই নামকরণ পূর্ব তুর্কিস্তান নামের সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ ইতিহাসকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। 'শিনজিয়াং' শব্দের অর্থ 'নতুন সীমান্ত' বা 'নতুন উপনিবেশ'। প্রশাসনিকভাবে এটি চীনের সবচেয়ে বড় অঞ্চল।

পূর্ব তুর্কিস্তানের জনসংখ্যা

পূর্ব তুর্কিস্তানের বাসিন্দাদের অধিকাংশই তুর্কি বংশোদ্ভূত। এর মধ্যে উইঘুর, কাজাখ ও কিরগিজ জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি বেশি। বিশেষ করে উইঘুররা সংখ্যায় অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। উইঘুর শব্দের অর্থ তাদের ভাষায় 'ঐক্য' ও 'সংহতি'। চীনের মুসলিম দশটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে উইঘুররা দ্বিতীয়। এই দশটি মুসলিম জাতি হলো, উইঘুর, কাজাখ, উজবেক, তাজিক, তাতার, হুই, সালার, দোংশিয়াং, বাওআন এবং কিরগিজ।

পূর্ব তুর্কিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশই উইঘুর। এ ছাড়াও এখানে কাজাখ, হুই, কিরগিজ ও অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। এদের বেশিরভাগই সুন্নি হানাফি মাজহাব অনুসারী।

চীনের সরকারি হিসাব অনুযায়ী, পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিম সংখ্যা প্রায় ১১ মিলিয়ন। তবে উইঘুরদের দাবি, তাদের প্রকৃত সংখ্যা ২৫ মিলিয়নেরও বেশি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পূর্ব তুর্কিস্তানের জনসংখ্যার কাঠামোতে বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে। চীনা কর্তৃপক্ষের মদদে দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হান' জাতিগোষ্ঠীর মানুষের অভ্যন্তরীণ অভিবাসন সেখানে বেড়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে অঞ্চলের জনমিতিক (Demographic) ভারসাম্য বদলে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ছে। যা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি নীতির অনুরূপ।

পূর্ব তুর্কিস্তানের কৌশলগত গুরুত্ব

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পূর্ব তুর্কিস্তান বর্তমান সময়েও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। একাধিক দেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই এলাকা ইতিহাসের প্রাচীন সিল্ক রোডের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই পথ দিয়েই চীন ও তৎকালীন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ওই পথ ধরে বাণিজ্য ও মানুষের চলাচলের মাধ্যমে অঞ্চলটিতে ইসলামের বিস্তারও ত্বরান্বিত হয়।

বর্তমানে চীনা সরকার 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' উদ্যোগের আওতায় প্রাচীন সিল্ক রোড পুনরুজ্জীবনের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে চায়। এ লক্ষ্যেই পূর্ব তুর্কিস্তানের ওপর তারা কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। তবে এই অঞ্চলের গুরুত্ব শুধু ভৌগোলিক অবস্থানেই সীমাবদ্ধ নয়। পূর্ব তুর্কিস্তান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এটি চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল। পাশাপাশি এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, সিসা, তামা, দস্তা ও ইউরেনিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ।

এ ছাড়া অঞ্চলটি চীনের ভারী ও সামরিক শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। চীনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ও আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও এই অঞ্চলে অবস্থিত।

কাশগর শহর

বর্তমানে পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রশাসনিক রাজধানী উরুমচি হলেও অঞ্চলটির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত কাশগর। প্রাচীন এই শহর শত শত ঐতিহ্যবাহী মসজিদের জন্য বিখ্যাত। ইতিহাসে কাশগরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি সভ্যতার বিকাশে যেমন এর অবদান রয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

ইসলামি ইতিহাসে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে কাশগরের রয়েছে আলাদা মর্যাদা। একসময় একে 'ছোট বুখারা' নামে ডাকা হতো। তখন মুসলিম বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী ইলম শিখতে এখানে আসতেন।

কাশগর মুসলিম সমাজকে বহু খ্যাতিমান আলেম উপহার দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত আলেম ও বক্তা আবু আল মাআলি তোগরুল শাহ মুহাম্মদ ইবন আল হাসান ইবন হাশিম আল কাশগরি। আজও কাশগর ইসলামের একটি প্রাচীন নগরী হিসেবে

পরিচিত, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অম্লান।

পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলমানদের ওপর দমন-পীড়ন তুলনামূলকভাবে বেশি কেন?

চীনে মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরেই নানা মাত্রার চাপ ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। তবে সব মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এক নয়। দেশের সবচেয়ে বড় মুসলিম জাতিগোষ্ঠী হুই সম্প্রদায়ের তুলনায় পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানদের, বিশেষ করে উইঘুরদের ওপর দমন-পীড়নের মাত্রা বেশি।

এর পেছনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। হুইসহ কয়েকটি মুসলিম জাতিগোষ্ঠী চীনা সমাজের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেশি একীভূত। তারা ম্যান্ডারিন ভাষায় কথা বলে, আলাদা ভাষাগত পরিচয় গড়ে তোলেনি এবং স্বাধীনতার দাবিও তোলে না। নামকরণসহ দৈনন্দিন জীবনযাপনেও তাদের অনেকটাই চীনা সমাজের সঙ্গে মিল দেখা যায়।

অন্যদিকে উইঘুর মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় ধরে রাখতে সচেষ্ট। তারা চীনা নাম এড়িয়ে আরবি ও ইসলামি নাম ব্যবহার করেন। পাশাপাশি ধর্মীয় পোশাক ও ইসলামি অনুশাসনের প্রতিও তারা বেশি অনুগত। এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই তাদের চীনা মূলধারার বাইরে আলাদা করে চিহ্নিত করে।

ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশীলনের এই স্বতন্ত্রতার কারণেই পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানদের, বিশেষ করে উইঘুরদের, চীনা কর্তৃপক্ষের কঠোর নজরদারি ও শোষণের মুখে পড়তে হচ্ছে।

তুর্কিস্তানে ইসলামের আগমন

উমাইয়া শাসনামলে খলিফা ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিকের শাসনকালে (৮৬–৯৬ হিজরি) পূর্ব তুর্কিস্তানে ইসলামের প্রসার ঘটে। ওই সময় মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম আল বাহিলি খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মার্ভকে কেন্দ্র করে অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্বেই তুর্কিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও নগরগুলো মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং সেখানকার জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে।

৯৫ হিজরি তে কুতাইবা পূর্ব তুর্কিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ শহর কাশগর বিজয় করেন। এরপর তিনি চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইতিহাসবিদদের মতে, এই সময় বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে চীনের ভেতরে ইসলামের প্রভাব আরও বিস্তৃত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনায় কাশগরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকেই কুতাইবা তাঁর দূত হুবাইরা ইবন মুশামরিজ আল কিলাবিকে চীনা সাম্রাজ্যের দরবারে পাঠান।

৩২২ হিজরিতে (খ্রিস্টাব্দ ৯৩৪) কারাখানী উয়িগুর গোত্রের শাসক খাকান সুতুক বোগরাখানের ইসলাম গ্রহণ মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর রাজপরিবারের সদস্যরা, প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরা এবং বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ একযোগে ইসলামে প্রবেশ করেন। ঐতিহাসিক সূত্রগুলো বলছে, সে সময় এক মিলিয়নেরও বেশি উয়িগুর পরিবারের মানুষ একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল ওই অঞ্চলে ধর্মীয় রূপান্তরের ক্ষেত্রে এক বিরল ঘটনা।

ইসলামের এই বিস্তার কেবল কারাখানী রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। চীন ও তিব্বত পর্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। খাকান সুতুক বোগরাখান ইসলামকে তাঁর রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এর ফলে প্রশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। স্থানীয় তুর্কি ভাষা উয়িগুর, কাজাখ ও কিরগিজ লেখার ক্ষেত্রে আরবি হরফের ব্যবহার শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে ইসলামের ভিত্তি আরও মজবুত হয়। ইসলামি সভ্যতার প্রভাব পড়ে স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা ও সামাজিক কাঠামোতে। কাশগর শহর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ইসলামি জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্র হিসেবে, যা শিক্ষা, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

একই সঙ্গে জোরদার হয় ধর্মীয় শিক্ষা ও দাওয়াহ কার্যক্রম। এর প্রভাব শুধু পূর্ব তুর্কিস্তানেই নয়, পুরো বৃহত্তর তুর্কিস্তান অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে ইসলাম একটি শক্তিশালী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে রূপ নেয়।

সেই সময় পূর্ব তুর্কিস্তান একটি শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পায়। খাকান সুতুক বোগরাখানের নাতি শিহাবুদ্দৌলা হারুন বোগরাখানের শাসনামলে রাষ্ট্রটি তার ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। এই সময় জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটে, ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাণ ফিরে আসে, গড়ে ওঠে অসংখ্য মাদরাসা। আরবি হরফে উয়িগুর ভাষায় লেখা বই সহজলভ্য হয়ে ওঠে, সমৃদ্ধ হয় গ্রন্থাগারগুলো।

একই সঙ্গে ইসলামের দাওয়াহ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার কিরগিজ তুর্কি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। এর ফলে জনসংখ্যাগত শক্তি বাড়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিও আরও দৃঢ় হয়।

এই সময় পূর্ব তুর্কিস্তান ছিল মুসলিম বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানকার মসজিদগুলোতে আব্বাসীয় খলিফা আল কাদির বিল্লাহর নামে খুতবা পাঠ করা হতো এবং তাঁর নামেই মুদ্রা জারি করা হতো। ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও অঞ্চলটি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় তুর্কিস্তানই দীর্ঘকাল ইসলামি শাসনের অধীনে থেকে সমৃদ্ধি ও উন্নত সভ্যতার এক উজ্জ্বল ধারা গড়ে তোলে। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ধর্মীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশ তুর্কিস্তানকে তৎকালীন বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর তুর্কিস্তানের জনগোষ্ঠী পরবর্তীকালে একের পর এক শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। গজনভি ও সেলজুক সাম্রাজ্যের উত্থানে তুর্কিস্তানের মানুষের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরপর অষ্টম হিজরি শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় উসমানি সাম্রাজ্য, যা প্রায় ৬০০ বছর ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়।

তবে অটোমান খিলাফতের পতনের পর এই অঞ্চল এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতিতে তুর্কিস্তানসহ বিস্তীর্ণ মুসলিম ভূখণ্ড 'ভাগ করে শাসন' নীতির আওতায় পড়ে। এর ফল হিসেবে রাজনৈতিক বিভাজন তীব্র হয়, দুর্বল হয়ে পড়ে অঞ্চলটির ঐতিহাসিক ঐক্য ও প্রভাব।

পূর্ব তুর্কিস্তানে মঙ্গোল আগ্রাসন

৬০২ হিজরিতে (খ্রিস্টাব্দ ১২০৬) চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মঙ্গোল আগ্রাসনের প্রথম শিকার হয় পূর্ব তুর্কিস্তান। মঙ্গোলিয়া থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান ছিল অত্যন্ত দ্রুত গতির ও

Sponsored by Tilmeez Academy

সহিংস। এই অভিযানের সময় মঙ্গোলরা পূর্ব তুর্কিস্তানের মানুষের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং অঞ্চলটি চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর পরিণতিতে বিশাল তাতার সাম্রাজ্য একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি অংশে মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তান অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার শাসনভার পান ওকেতাই বংশের শাসক আরতুক বুগা।

এই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে এক মঙ্গোল নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম তুরমা চিবরিন। ৭২২ হিজরিতে (খ্রিস্টাব্দ ১৩২২) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর বিপুলসংখ্যক মঙ্গোল ইসলাম গ্রহণ করে। ইতিহাসে এই ঘটনা বিস্ময় সৃষ্টি করে। সাধারণত দখলদার শক্তি দখলকৃত জনগোষ্ঠীকে পরাভূত করে; কিন্তু এখানে দেখা যায়, দখলদাররাই পরাজিত জনগোষ্ঠীর ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

মুসলমানদের সঙ্গে মঙ্গোলদের সম্পর্কের ইতিহাসে এটি একমাত্র বিস্ময়কর ঘটনা নয়। এর আগেই মঙ্গোলদের প্রভাবশালী নেতা বারকে খান ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর গোত্র। ইতিহাসে তার সময়কাল 'গোল্ডেন হোর্ড' নামে পরিচিত। তারা মধ্য এশিয়ার ককেশাস অঞ্চলে বসবাস করত। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে পূর্ব তুর্কিস্তানেও। সেখানে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং মঙ্গোলদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক উন্নত হতে থাকে। বিশেষ করে মুসলমানদের আচার-আচরণ ও লেনদেনের সততার কারণে।

'মঙ্গোল যুগ' নামে পরিচিত ইউয়ান সাম্রাজ্যের শাসনকাল (৬৫৮–৭৬৯ হিজরি / ১২৬০–১৩৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল মুসলমানদের উত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে প্রশাসন ও রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন চীনের ১২টি প্রদেশের মধ্যে ৮টির শাসনভারই ছিল মুসলিম শাসকদের হাতে।

মিং বংশের শাসনামলে পূর্ব তুর্কিস্তান (৭৬৯–১০৫৪ হিজরি / ১৩৬৮–১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

এ সময়ে পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানরা চীনা সমাজের সাথে মিলেমিশে থাকলেও নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় অটুট রেখেছিলেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলিম কর্মকর্তাদের উপস্থিতির ফলে সেখানে ইসলামের মর্যাদা ও প্রভাব দুই-ই বৃদ্ধি পায়। এই প্রভাবের ছাপ তৎকালীন চীনা স্থাপত্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে চীনা নির্মাণশৈলীর পাশাপাশি ইসলামি শিল্পের নান্দনিক কারুকাজ এক অনন্য মাত্রা যোগ করে। তবে মানচুর শাসনামলে এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়।

মানচু সাম্রাজ্য আমলে পূর্ব তুর্কিস্তান

চীনের মানচু (চিং) রাজবংশের শাসনকাল চীন ও পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানদের ইতিহাসে ছিল অত্যন্ত কঠিন এক সময়। নিপীড়ন ও স্বৈরশাসনের কারণে এ সময় মুসলমানদের অবস্থার অবনতি ঘটে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করে চীনের অত্যাচারী শাসকরা। এতে বহু মুসলমান প্রাণ হারান।

এই সময় চীন কয়েক দফা পূর্ব তুর্কিস্তান দখলের চেষ্টা চালায়। শুরুতে এসব প্রচেষ্টা সফল না হলেও শেষ পর্যন্ত ১১৭২ হিজরিতে (১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ) অঞ্চলটি দখলে নেয় মানচু শাসকেরা। এরপর কয়েক দশক ধরে পূর্ব তুর্কিস্তান তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে স্থানীয় মুসলমান জনগোষ্ঠী এই পরিস্থিতি মেনে নেয়নি। ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসের মধ্যেও তারা প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। দীর্ঘ এই সংঘাতে লক্ষাধিক মুসলমান শহিদ হন। টানা প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলা এই লড়াইয়ের পর অবশেষে ১২৭৯ হিজরিতে (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ) মুসলমানরা নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

উইঘুররা সেখানে টানা ১৩ বছর একটি ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও সেই স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্প সময়ের মধ্যেই ১২৯২ হিজরিতে (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) ব্রিটিশদের সহায়তায় আবারও পূর্ব তুর্কিস্তান দখলে নেয় চীন। পরে ১২৯৭ হিজরিতে (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ) অঞ্চলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের একটি প্রদেশ ঘোষণা করা হয় এবং নাম বদলে রাখা হয় শিনজিয়াং। এর মধ্য দিয়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে দমন–পীড়নের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

ঐতিহাসিকদের মতে, ব্রিটিশ সহায়তার পেছনে ছিল তৎকালীন জার শাসিত রাশিয়ার উপনিবেশবাদ নিয়ে উদ্বেগ। রাশিয়ার প্রভাব বাড়ার আশঙ্কায় নিজেদের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশরা তখন চীনা শাসকদের আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দেয়, যার ফলে পূর্ব তুর্কিস্তান দ্বিতীয়বারের মতো চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

পূর্ব তুর্কিস্তান ও চীন-জাপান যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীন জাপানের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ১৩২৫ হিজরিতে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) জাপানি সেনারা চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে প্রবেশ করে। সে সময় চীনের বিভিন্ন এলাকায় জাপানি বাহিনীর হাতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চললেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে দমন–পীড়নের মাত্রা ছিল তুলনামূলকভাবে কিছুটা শিথিল। অঞ্চলটিতে একটি কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল এর পেছনের উদ্দেশ্য।

এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে উইঘুররা চীনা শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৩৫২ হিজরিতে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ব তুর্কিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। তবে এই স্বাধীনতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র এক বছরের মধ্যেই চীন সরকার রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতায় গিয়ে অঞ্চলটি পুনরায় দখল করে নেয়। ফলে ১৩৫৩ হিজরিতে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ব তুর্কিস্তান আবার চীনের দখলে চলে যায়।

এরপর চীন সরকার পূর্ব তুর্কিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান খোজানিয়াজ, তাঁর প্রধানমন্ত্রী দামলাসহ আরও প্রায় ১০ হাজার মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পূর্ব তুর্কিস্তান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান বড় ধরনের পরাজয়ের মুখে পড়ে এবং চীন থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। একই সময় চীনে মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লব সফল হয়। এর পর পশ্চিমা সহায়তায় তৎকালীন ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী সরকার চীন ছেড়ে তাইওয়ানে সরে যায়। বেইজিংয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা যায় কমিউনিস্টদের হাতে।

এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগে পূর্ব তুর্কিস্তানে আবারও তৎপরতা দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ১৩৬৩ হিজরি (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে সেখানে পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এই রাষ্ট্রও টেকসই হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যেই মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা